মানহাজ!

সাজ্জাদ জহির

---

[১]

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

> “এরাই (নবিগণ) তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন। বলুন, ‘এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ।” (সূরা আল-আন'আম, ০৬:৯০)

আদম (আঃ) থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবিগণের (আলাইহিমুস সালাম) জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, জাতিকে এক আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসা। যেন, আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি, নেতা, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রাধান্য না থাকে; অর্থাৎ, এককভাবে কেবল আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যই হবে আবশ্যক।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

> আর আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।’ (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

> “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।” (সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬)

সকল নবি (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন জমিনে তাওহিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়। প্রত্যেক ব্যক্তি, সত্তা ও শক্তির উর্ধ্বে জমিনে আল্লাহ তা’আলার দ্বীনকে প্রবল করার জন্যই নবিরা নিজ সংগীদের নিয়ে মেহনত করেছেন।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

> “আর কত নবি ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান, ০৩:১৪৬)

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

> “আল্লাহর দ্বীনে ইমামত বা নেতৃত্ব একটি কাঙ্খিত বিষয়। নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব (ইমামত) ব্যতীত পৃথিবীতে মুসলিমের

ইবাদত বাস্তবায়িত হয়না। আর এখানে আমরা ইমামত ও ইমাম দ্বারা বুঝাচ্ছি, যা অর্জন হবে বিজয় ও শক্তির মাধ্যমে। ক্ষমতাশীল হওয়ার মাধ্যমে। তাই পৃথিবীতে মুসলমানদের তামকিন যত বৃদ্ধি পাবে, তাদের ইবাদতও তত বৃদ্ধি পাবে। আর পৃথিবীতে মুসলমানদের ক্ষমতা যত হ্রাস পাবে, তাদের ইবাদতও তত হ্রাস পাবে।"

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআনের এই আয়াত থেকে নবিগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আরো বিস্তারিতভাবে জানা যায়—

وَ جَعَلۡنٰهُمۡ اَئِمَّۃً یَّهۡدُوۡنَ بِاَمۡرِنَا وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡهِمۡ فِعۡلَ الۡخَیۡرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوۃِ وَ اِیۡتَآءَ الزَّکٰوۃِ ۚ وَ کَانُوۡا لَنَا عٰبِدِیۡنَ

"আর আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে; আর আমি তাদেরকে সৎকাজ করতে ও সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ওহী পাঠিয়েছিলাম; এবং তারা আমাদেরই ইবাদাতকারী ছিল।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭৩)

সুতরাং, তাওহিদের কর্তৃত্বের অন্যতম অর্থই হচ্ছে, জমিনে মানুষের সকল বিষয় নির্ধারিত হবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুযায়ী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, করনীয়-বর্জনীয়, ব্যবস্থাপনাগত বা মূল্যবোধগত সকল কিছুই ঠিক করা হবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী, কেননা এ পথে সাম্য, শান্তি, ইনসাফ ও ভারসাম্য নিশ্চিত। এ পথে অর্জিত হয় আত্মিক প্রশান্তি ও সামাজিক ভারসাম্য। যা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্তারিত জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন। পাশাপাশি, জাতির ইমাম নবি আলাইহিমুস সালামরা নিজেরাও ছিলেন ইবাদত ও আখলাকে সবার অগ্রগামী।

আর এতেও সন্দেহ নেই যে, নবিরা নিজ জাতিকে সর্বপ্রথম তাদের উপর চেপে বসা কর্তৃত্ববাদীদের কুফর ও জুলুমের কবল থেকে বের করে আনতে চেয়েছেন, কারণ তারাই তাওহিদের পথে প্রধান বাধা হয়ে থাকে। আর হিদায়াতের পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে চিহ্নিত করে, তা থেকে মানবজাতিকে রক্ষার মেহনত ছাড়া ইবাদত নিশ্চিত করা সম্ভব না। প্রবৃত্তিপূজারী বিত্তশালী বা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাবানদের হাতে পিষ্ট মানবতাকে মুক্তি দেয়াও সম্ভব না।

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّذِیۡرٍ اِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوۡهَاۤ ۙ اِنَّا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ کٰفِرُوۡنَ

"আর আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরী করি।" (সূরা সাবা, ৩৪:৩৪)

وَ اِذَاۤ اَرَدۡنَاۤ اَنۡ نُّهۡلِکَ قَرۡیَۃً اَمَرۡنَا مُتۡرَفِیۡهَا فَفَسَقُوۡا فِیۡهَا فَحَقَّ عَلَیۡهَا الۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنٰهَا تَدۡمِیۡرًا

"আর আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি, ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে; অতঃপর সেখানকার প্রতি শাস্তির আদেশ ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমরা তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।" (সূরা ইসরা, ১৭:১৬)

কুরআন মাজীদের বহুস্থানে বর্নিত হয়েছে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রুখে দাঁড়াতো সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী, যারা ছিল অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ — আল আনআম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮০, ৯০; সূরা হুদ, ২৭; বনী-ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিনূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮, ৪৬, ৪৭ এবং আয যুখরুফ, ২৩ আয়াতসমূহ দেখা যেতে পারে।

সুতরাং, কর্তৃত্ববাদী কুফরি শক্তির অপসারণ ছাড়া তাওহিদ ও ইবাদত পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই জমিনে, তথা মানুষের উপর তাওহিদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য কুফরী শাসনকর্তৃত্বের অপসারণ অপরিহার্য। নবিগণের (আ) আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দানকারী, মানবজাতির জন্য রহমতরূপে প্রেরিত সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের উদ্দেশ্য

দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে—

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯:৩৩)

আর এ উদ্দেশ্যেই নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদের (সা) উপর নাযিল হয়েছে কিতাব, যেন কুফরের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় মানবজাতিকে নিয়ে আসা হয়—

الٓرٰ کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡکَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۬ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰی صِرَاطِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।" (সূরা ইব্রাহিম, ১৪:০১)

সুতরাং, জমিনে ও মানুষের উপর আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নবিগণের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যে নবিগণের রেখে যাওয়া জিম্মাদারি আদায়ের কারণেই উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব-

کُنۡتُمۡ خَیۡرَ اُمَّۃٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ تَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوۡ اٰمَنَ اَهۡلُ الۡکِتٰبِ لَکَانَ خَیۡرًا لَّهُمۡ ؕ مِنۡهُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ اَکۡثَرُهُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা আল-ইমরান, ৩:১১০)

এলক্ষ্যে আমৃত্যু নবিগণ চেষ্টা করে গেছেন, মানুষ যেন আল্লাহ তা'আলার বিধানের অধীনে চলে আসে। বিশেষত, মানবজাতির উপর থেকে কুফরের কর্তৃত্ব অপসারণ এবং ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নবিগণের প্রধান লক্ষ্য। কেননা, ব্যক্তি, সমাজ তথা গোটা মানবজাতির জন্য কিসে কল্যাণ, তা কেবলমাত্র সেই সত্তাই জানতে পারেন, যে সত্তা সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

اَلَا یَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানবেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত।" (সূরা আল-মুলক, ৬৭:১৪)

তাই, যে বা যারাই আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব, স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিয়েছে; তার জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক অঙ্গন থেকে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিরংকুশ আনুগত্য মেনে না নেয়ার মানেই হচ্ছে—আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা। উল্লেখ্য, আত্মিক দূর্বলতার কারণে কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রতিপালন না করতে পারা এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অনুশোচনাহীনভাবে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করা এক নয়। প্রথমটি ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে না, কিন্তু পরবর্তী অবস্থানগ্রহণকারী ব্যক্তি মুসলিম থাকতে পারেনা।

দুনিয়াতে মানুষের উপর কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই যেন কার্যকর থাকে; যেন আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের ইনসাফ মানবসমাজের দুনিয়াবি জীবন ও আখিরাতের জীবনকে করে তোলে কল্যাণে পরিপূর্ণ, এটি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা আমাদের দায়িত্ব। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। এবং আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে

তার ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۗ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরাঃ আল-ইমরান, ৩:১১০)

আর, নবিগণের পথের অনুসরণেই আসে প্রকৃত প্রশান্তি। যা কাড়ি কাড়ি টাকা, সুবিশাল অট্টালিকা কিংবা সুন্দরী নারী দ্বারা অর্জন করা যায় না!!

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।” (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৭)

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের মতে এখানে ‘হায়াতে তাইয়্যেবা’ বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। দাহহাক বলেছেন, হায়াতে তাইয়্যেবা হল ‘হালাল রিযক ও দুনিয়াতে ইবাদাত করার তাওফিক।’

আর নবিগণের পদাংক অনুসরণ করে জমিনে তাওহিদের দাবির বাস্তবায়ন হচ্ছে ঈমান ও নেক আমলের সর্বোচ্চ চূড়া; সকল নেক আমলই তাওহিদের মেহনতকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে থাকে। যে বা যারাই নবিগণের পথ থেকে সরে গিয়ে, ইবাদতের পূর্ণতা বিধানের আমানতকে উপেক্ষা করে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তার জন্য দুনিয়াতে থাকবে অতৃপ্ত, সংকীর্ণ জীবন।

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

“আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত।” (সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৪)

অর্থাৎ, ইবাদতে গাফিলতির দরুণ তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। যা তাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আত্মিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদা-সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্য্যে নয়।

তাই, আখিরাত তো বটেই, দুনিয়াতেও যদি কেউ প্রশান্তির জীবন চায়; তার উচিৎ ইসলামকে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন দ্বীন-মতবাদসহ সমস্ত কিছুর উপর বিজয়ী করা। কেবলমাত্র এই মহান আদর্শ বাস্তবায়নই ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতাকে সম্পদের অসম বণ্টন, স্বেচ্ছাচারীর আগ্রাসনসহ সকলপ্রকার জুলুমের নিষ্পেষণ থেকে নিস্কৃতি দিতে পারে। কেননা, তাওহিদের বাস্তবায়নই হলো আমাদের ইবাদতসমুহের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত, যা আমাদের দান করবে হায়াতে তাইয়্যিবা। আর এটাই আল্লাহ তা’আলার সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

“হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা

সমূহ সুদৃঢ় করবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:০৭)

আর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে সাহায্য করতেই, আল্লাহ তা’আলা সমস্ত মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন মুমিনরা যেনো আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ

“হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।” (সূরা আস-সফ, ৬১:১৪)

[২]

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামি সভ্যতার কর্তৃত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নজির ইতিহাসে আগে-পরে পাওয়া যায় না। এই কর্তৃত্ব বিভিন্ন মাত্রায় টিকে থাকে উনিশ শতক পর্যন্ত। তারপর, জাতির উত্থান পতনের সূত্রানুযায়ী আল্লাহ্ তা’আলা এই জাতির নেতৃত্ব খর্ব করলেন।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَ مِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ

মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। (সূরা রাদ, ১৩:১১)

اَوَ لَمۡ يَهۡدِ لِلَّذِيۡنَ يَرِثُوۡنَ الۡاَرۡضَ مِنۡۢ بَعۡدِ اَهۡلِهَاۤ اَنۡ لَّوۡ نَشَآءُ اَصَبۡنٰهُمۡ بِذُنُوۡبِهِمۡ ۚ وَ نَطۡبَعُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُوۡنَ

জমিনের অধিবাসীদের (চলে যাবার) পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এ কথা পরিষ্কার হয়নি যে, আমি যদি চাই, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? (সূরা আরাফ, ৭:১০০)

ফলে মুসলিমদের কর্তৃত্ব খর্ব হল। পাশাপাশি, ইউরোপের ভোগবাদী জীবনাদর্শকে এই উম্মাহর অধিকাংশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বুঝে বা না বুঝে গ্রহণ করে নিলো। আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, উম্মাহ আজ শরীয়াহর বদলে গণতন্ত্রকে, কুরআনের বদলে মানবরচিত সংবিধানকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদলে শেখ মুজিব বা কামাল পাশাকে, আলেমদের পরিবর্তে সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিদের বেছে নিয়েছে। যারা সচেতনভাবে বাতিলকে হকের উপর গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের কুফর ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল এই উম্মাহর সিংহভাগই গাফিলতি ও অজ্ঞতাবশত এই মরীচিকার পেছনে ছুটছে। ওয়াল্লাহুল মুস্তা’আন। উম্মাহর এই দুরবস্থার জন্য কাফের মুরতাদ মুনাফিক গোষ্ঠীর অনবরত চক্রান্ত এবং গোমরাহ, বেতনভোগী আলেম-দাঈরা যেমন দায়ী, একইভাবে উম্মাহর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও বুঝদার অংশটির একক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাবও সমানভাবে দায়ী।

অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে এই উম্মাহর মাঝে, পর্যাপ্ত সংখ্যক সুযোগ্য, মুখলিস দাঈ ইলাল্লাহর অভাবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুশি দাইয়্যান, থিওডর হার্জেল বা টি আই লরেন্স উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে, জীবনের উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছে—খিলাফতের অবশিষ্টাংশটুকুও মুছে ফেলতে এবং ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। আর অব্যবহিত কাল পরেই তারা সফল হয়েছে। লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কিরা কারাগার আর নির্বাসনের মাঝে জীবন পার করা সত্ত্বেও অন্তঃসারশূন্য, বাস্তবতা বিবর্জিত এক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র।

এমনকি, মাত্র ৪০ বছর পূর্বের স্থাপিত শিয়া-রাফিদা রাষ্ট্র ইরান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি দোর্দণ্ড প্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। নিজেদের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক ও কূটনীতিক কর্মসূচীর প্রভাব পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার করতে তাদের জেনারেলরা বিরামহীন সফরে জীবন অতিবাহিত করছে।

আর আফসোস হকের পতাকা বহনের দাবিদার এই উম্মাহর প্রতি। সমস্যা কেবল জনসাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলেও হয়তো ক্রান্তিকাল এত দীর্ঘায়িত হতো না। এখনো মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের কিছুসংখ্যক ছাড়া বাকিগুলোতে তাওহিদ ও ইসলামি বিপ্লবের অগ্রযাত্রা থমকে আছে। দুঃখজনকভাবে, আমাদের জাতিও এর ব্যাতিক্রম নয়।

তাই আমাদের শুরুর আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি হয় যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়াতে নবিগণের (আ) প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাস বানানো, তাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে বের করে আনা, পৃথিবী থেকে সমস্ত তাগুতদেরকে নির্মূল করা এবং পৃথিবীকে নৈরাজ্য থেকে মুক্ত করা।

উম্মাহর পূর্বসূরী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই দ্বীন বুঝেছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন। ফলে এটা তাদের অন্তরে একটি বদ্ধমূল চিত্র ও অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়। একারণে তারা রিসালাতের বুঝ ও ইলম সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন।

ইমাম তবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন:

> "সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. পারস্যের সেনাপতি রুস্তমের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত রিবয়ী ইবনে আমর (রা.)-কে রুস্তমের উদ্দেশ্যে কাদিসিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন।
>
> তখন সে জিজ্ঞেস করল: তোমরা কী কারণে এসেছো?
>
> রিবয়ী রাযি. বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন, যেন আমরা তার বান্দাদের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি চান, তাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে তাঁর দাসত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং সকল দ্বীনের (জীবনাদর্শের) জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে যেতে পারি।
>
> তাই তিনি আমাদেরকে তার দ্বীন দিয়ে তার বান্দাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাদেরকে তার দিকে আহবান করি। সুতরাং যে আমাদের থেকে তা গ্রহণ করবে, আমরা তাকে মেনে নিবো, তার থেকে ফিরে যাবো এবং তাকে তার নেতৃত্বে বহাল রাখবো। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবো, যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয়ের দিকে পৌঁছে যাই।
>
> সে জিজ্ঞেস করল: প্রতিশ্রুত বিষয় কী?
>
> বললেন: তা হলো, যে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হবে, তার জন্য আছে জান্নাত আর যে বেঁচে থাকবে, তার জন্য আছে বিজয়।"

তারপর উম্মতের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রম করল। ফলে পিছুটান শুরু হলো। প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া হলো। যেন যুগ সে সময়ের দিকে ঘুরে গেল, যে সময় তা শুরু হয়েছিল। দ্বীন তার প্রাথমিক অপরিচিত অবস্থার দিকে ফিরে গেল। যেমন হাদিসের মধ্যে এসেছে:

> "ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। অচিরেই তা যেভাবে শুরু হয়েছে, সে অবস্থার দিকেই ফিরে যাবে। আর সেসকল অপরিচিতদের জন্য আছে সুসংবাদ।"

ইবনে খালদুনের ভাষায়—

"যেন মহাবিশ্বের মুখপাত্র বিশ্বকে নিস্তেজতা ও সংকোচনের ডাক দিল, আর বিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়া দিল।"

পৃথিবীর এই নিস্প্রভতার পর সংস্কারের প্রয়োজন হয়। সংস্কার তো সেই অস্পষ্টতার পরেই হয়ে থাকে, যাকে ভিন্নভাবে বলা যায় ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাওয়া। এই সংস্কার ইতিপূর্বে করে থাকতেন নবিরা (আ), যার পূর্ণতা লাভ হয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। তারপর সংস্কারের দায়িত্ব বর্তায় উম্মতে মুহাম্মাদি (সা.) এর উপর। যাদের পরিচয়,

وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ نَّبِیٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّیُّوۡنَ كَثِیۡرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوۡا لِمَاۤ اَصَابَهُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوۡا وَ مَا اسۡتَكَانُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰبِرِیۡنَ

"আর কত নবি ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩:১৪৬)

'উকবা ইবন আমির (রাযি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لايضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. (صحيح مسلم).،

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল শত্রুদের পরাস্তকারী হয়ে আল্লাহর নির্দেশের উপর অবিচল থেকে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর চলমান থাকবে'।[1]

নবিগণের (আ) আগমনের ধারা সমাপ্ত হবার পর, মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনার মহান দায়িত্ব বুঝে নেন নবি মুহাম্মাদ (সা.) এর পতাকাবাহীরা; যাদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আস সিদ্দিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর, যুগে যুগে নবিগণের উত্তরসূরীরা বারবার পতনের পর, আল্লাহর দ্বীনের উত্থান ঘটিয়েছেন। যা আল্লাহর নবি (সা.) এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কেননা আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون

'মুগিরা ইবন শু'বা (রাযি) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় সর্বদা মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

যুগে যুগে নবিগণের মানহাজ আঁকড়ে ধরা আল্লাহওয়ালাদের কাফেলাই জমিনে হিদায়াতের চেরাগ জালিয়ে রাখেন। কুফর ও জুলুমের বিরুদ্ধে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে ইসলামের পতাকা বহন করেন।

বারবারই, উম্মাহ তাওহিদের দাবি থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ভুলের মাশুল দিয়েছে আর নবিগণের প্রকৃত উত্তরসূরীরা দাঁড়িয়ে গেছেন, বিপরীত দিকে ঘুরে যাওয়া ঘড়ির কাঁটা সঠিক পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মুতাজিলা, ক্রুসেডার, রাফেজি বা তাতারদের ফিতনার মতো ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে আল্লাহর দ্বীন ও উম্মতকে সুরক্ষা দিতে এগিয়ে এসেছেন নবিজীর পতাকাবাহীরা। যেমন—আবু বকর, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, ইবনে তাইমিয়া, সাইফুদ্দিন কুতুজ বা মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ ইমামগণ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এখন সময় এসেছে নবিগণের উত্তরাধিকারী, নেককার পূর্বসূরীদের ন্যায় পুনরায় জাতিকে সংস্কারের। পাশাপাশি এও উল্লেখ্য,

তাওহিদের কর্তৃত্ব কেবল রাজনৈতিক, জ্ঞানগত বা অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। নবিগণের উদ্দেশ্য এমন সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করাই ছিল নবিগণের উদ্দেশ্য, যার প্রধানতম বাধা ছিল জাতির মাঝে কুফরের কর্তৃত্ব। তাই, সমাজের কুফরের নেতাদের কর্তৃত্বকে ইসলামের কর্তৃত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করাই নবিগণের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল; কিন্তু মূলত, নবিগণের সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল মানুষকে নিজের খেয়ালখুশি, সকলপ্রকার ভ্রান্ত চিন্তা ও সীমালঙ্ঘনকারীর (চাই উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা হোক নিজ পিতা, পরিবার, পীর, শাসক বা মুরুব্বি) আনুগত্য থেকে মুক্ত করে এককভাবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসা।

এবিষয়টি ভুলে যাওয়ার কারণেই, কোনো কোনো গোষ্ঠী কেবল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনকে লক্ষ্য সাব্যস্ত করে, ভ্রান্ত আকিদা ও মতবাদসমূহকে মেনে নিয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে সকলপ্রকার আপোষ ও হীনমন্যতা মেনে নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছেন, অথচ নিজেদেরকে মানহাজুল আম্বিয়ার পতাকাবাহীও মনে করছেন। আবার, অনেকেই কেবল মুসলিমদের মাঝে বিদ্যমান কিছু ভ্রান্ত চিন্তার অপনোদন আর শাখাগত মাসআলার বিতর্কে মশগুল হয়ে কুফরের রাজনৈতিক ও সামগ্রিক আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রয়েছে!!

তাই নববি মানহাজের অনুসারীদের জন্য সকলপ্রকার বাতিলের অপসারণে ফিকর ও মেহনত করা জরুরী, যেন দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। তবে, অবশ্যই কুফর ও বাতিলের মাত্রা অনুযায়ী ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই, শরীয়াহসম্মত সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে কুফরের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অপসারণ এবং জাতির ধারাবাহিক ঈমানী ও চিন্তাগত পরিশুদ্ধির আন্দোলনই তাওহিদ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

> “নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে নবিগণের কর্মতৎপরতার কুরআনী বিবরনের মাধ্যমে ফুটে উঠে যে, তারা সকলেই একটি মৌলিক বিষয়ে এক ছিলেন। এটাই সেই হাদিসের কথা, যাতে বলা হয়েছে—
>
> ‘মানুষের সাথে নবিগণের লড়াই ও সংঘাতের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মাঝে আল্লাহর ‘উবুদিয়্যাহ’ বা দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা।’
>
> ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে মানুষ সবচেয়ে বড় যে বিপদে আক্রান্ত হয়, তা হল শিরক। এটা মানবজীবনের সবচেয়ে বড় জুলুম বা অন্যায়।
>
> আল্লাহ তা’আলা বলেন:
>
> {إن الشرك لظلم عظيم}
>
> “নিশ্চয়ই শিরক ভয়াবহ জুলুম।”
>
> নবিগণের লড়াই ছিল এই বক্রতাকে সোজা করার উদ্দেশ্যে এবং তাকে সঠিক পথে, অর্থাৎ তাওহিদের পথে ফেরানোর উদ্দেশ্যে। যেহেতু নবিগণ আল্লাহর দূত ও তাঁর দাস, একারণে তারা সর্বপ্রথম যে দায়িত্বটি পালন করেন, তা হল পৃথিবীতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং এই সুরক্ষিত বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষ যে অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তা মানুষের সামনে উন্মোচন করা।
>
> যদিও এটা এমন এক অন্যায় আরো বহু অন্যায়ের জনক—যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জুলুম ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম হকটির সংশোধন ছাড়া এসবগুলোর সংশোধন আলাদাভাবে হওয়া সম্ভব নয়।...
>
> এই শিকড়টি পাশ কাটিয়ে গেলে একজন মুসলিম আল্লাহর সেই দাসত্ব থেকে দূরে সরে যাবে, যা তার কর্তব্য ছিল। আর সেই কর্তব্য হল নবিগণের দাওয়াতের বাস্তবায়নকারী হওয়া।

> সরাসরি বলতে গেলে বলতে পারি, একজন মুসলিম যখন সামাজিক বিশৃঙ্খলাগুলো দূর করার জন্য নিজেকে একজন সমাজ সংস্কারকরূপে দাঁড় করায়, অথবা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাগুলো দূর করার জন্য নিজেকে একজন রাজনৈতিক সংস্কারক রূপে দাঁড় করায়, অথবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য নিজেকে একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরূপে দাঁড় করায়। তখন এই ভূমিকাগুলোর মাঝে কুরআনে বর্ণিত নবিগণের মেহনতের প্রধান চিত্রটির অনেকগুলো নিদর্শন অনুপস্থিত দেখা যায়।
>
> এর আলোকে আমরা প্রতিটি ইসলামি দলের প্রকৃত রূপ জানতে পারি; অর্থাৎ তারা কুরআনে বর্ণিত নবিগণের দাওয়াত থেকে কতটা নিকটে বা কতটা দূরে। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে নবিগণের যুদ্ধটি ছিল শিরকের মোকাবেলায় তাওহিদের যুদ্ধ। অর্থাৎ তাওহিদের পতাকাতলে যুদ্ধ।"

তাই, সমাজে তাওহিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সম্ভব। মৌলিক দাওয়াতকে পাশ কাটিয়ে শাখাগত সংস্কারের চিন্তা হবে নবিগণের দাওয়াতের বিপরীত অবস্থান। এখন যদি আমরা তাওহিদের বিপ্লব চাই; যেমন চেয়েছিলেন নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম); তাহলে করণীয় কী?

কিভাবে নবিগণের লড়াইয়ের পূর্ণতা বিধান সম্ভব হবে?

কিভাবে এই মহান উদ্দেশ্য তথা জাতির মাঝে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা পুনরায় সম্ভব হবে??

এজন্য অপরিহার্য সঠিক আকিদা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক অগ্রগতির মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করা। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ মেহনত হবে সঠিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে।

কেননা, কোনো দাওয়াত টিকে থাকা, স্থায়ী হওয়া এবং তারও পূর্বে প্রচার-প্রসার লাভের জন্য সংগঠিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কোনো জামাত, গ্রুপ বা দল থাকা ছাড়া কোনো চিন্তাধারাই অস্তিত্বে আসে না বা টিকে থাকে না। যদি ক্ষুদ্র জামাআতেরও অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে তামকিন (কর্তৃত্ব) লাভ এমন বিষয়, যা কল্পনাও করা যায় না।

তাই প্রয়োজন হলো—নববি দাওয়াহ, মানহাজ ও রব্বানী নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত মেহনত!

[৩]

আমরা আজ এমন এক পরিস্থিতিতে বসবাস করছি, যখন শত্রুরা খ্যাপা কুকুরের মতো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ক্রমাগত আক্রমণ ও বহুমুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উম্মাহর জন্য আবশ্যক হল তাদের শক্তিগুলোকে একত্রিত করা এবং প্রচেষ্টাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা। উম্মাহ আজ তার প্রতিটি সৈন্য, প্রত্যেক আলেম এবং সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী প্রত্যেক জ্ঞানীর প্রতি মুখাপেক্ষী। এই যখন উম্মাহর অবস্থা, তখন উম্মাহ তাদের মহান সেনাপতি ও সম্মানিত নেতৃবৃন্দের প্রতি কতটা মুখাপেক্ষী?

নিশ্চয়ই সফল জাতি তারাই, যারা তাদের বড়দের মর্যাদা বোঝে, তাদের হেফাজত করে ও তাদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থানে আসন দান করে। আর জামানার এই মহান ব্যক্তিরাই হচ্ছেন নবিগণের পতাকাবহনকারীরা; যারা আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাবদের প্রকৃত অনুসারী।

শয়তানের অনুসারীদের সর্বাত্মক চেষ্টার ফলস্বরূপ—সর্বব্যাপী কুফর, জুলুম ও ভ্রান্ত চিন্তার মহামারী সত্ত্বেও, সমাধান তাই আমাদের সামনেই রয়েছে! আর তা হচ্ছে, নবিগণের প্রকৃত উত্তরসূরীদের মানহাজকে আঁকড়ে ধরা। ইতিহাস ও সময় আমাদের সাক্ষ্য দেয় বর্তমান সময়ে নবিগণের মানহাজের উপর উম্মতকে দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব দানকারী মহান ব্যক্তিরাই জাতিকে অন্ধকারের মাঝে আলো দেখাচ্ছেন। ফা লিল্লাহিল হামদ।

তাঁরা প্রমাণ করেছেন, আদর্শের বিজয় কেবল তত্ত্বকথার মাধ্যমে আসে না। বিজয় ও কর্তৃত্ব আসে আদর্শের গভীর উপলব্ধি, সঠিক

মানহাজের আলোকে সংগঠিত হওয়া এবং সেপথে অবিচল থাকার মাধ্যমে। তাই, যুগে যুগে হিদায়াতের ইমামরা শুধু তত্ত্ব উপস্থাপন করেই দায়িত্বপালন শেষ করেন নি, বরং নবিগণের মানহাজ অনুযায়ী সংগঠিত মেহনতও করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করেই বলা যায়, আমাদের সময়ে নবিগণের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন ও নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিরা হচ্ছেন—শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম, ইমাম উসামা আবু আবদুল্লাহ, শায়খ ডক্টর আবু মুহাম্মাদ আইমান, শায়খ আবু মুসআব, শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি, শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি প্রমুখরা।

এই মহান ব্যক্তিরাই উম্মতকে নববি মানহাজের আলোকে সেই আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন, যে পথে সফলতালাভ সম্ভব। যার দৃশ্যমান প্রভাব ইয়েমেন, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, মালি এবং অন্যান্য কিছু স্থানে দেখা গেছে। ইন শা আল্লাহ সামনে আরও দেখা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এখনো বিমূর্ত মনে হলেও, এই মুবারাক আন্দোলনের বাস্তব প্রভাব গোটা দুনিয়াতেই বিদ্যমান।

কেননা, সময়ের ইমামদের দেখানো পথে পরিচালিত আন্দোলনগুলো যেখানে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছে, সেখানে রাব্বুল আলামিনও স্বীয় ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন!

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَهُمۡ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا ؕ وَ مَنۡ کَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক। (সূরা নুর, ২৪:৫৫)

বিগত তিন যুগে মুসলিম দেশগুলোতে যে আন্দোলনগুলোই ইমামদের নববি মানহাজ জেনেছে, বুঝেছে ও আঁকড়ে ধরেছে তারাই কামিয়াবির পথে এগিয়েছে। যে বা যারাই সময়ের ইমামদের মানহাজ থেকে নিজেকে যতটুকু সরিয়ে নিয়েছে, তারা ততটুকুই ব্যর্থতার স্বীকার হয়েছে।

আমরা যদি আমাদের ভূখণ্ডে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার বাস্তবায়ন দেখতে চাই, ইসলামের শাসন ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে চাই; তবে ইসলামি আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে—নবিগণের উত্তরসূরী, জামানার ইমামদের মানহাজ ও দিকনির্দেশনার অনুসরণই কাম্য।

কী সেই মানহাজ?

এর উত্তর হল—শারঈ ও সার্বজনীন মূলনীতির আলোকে—অগ্রগামী জামাআতের নেতৃত্বে সুসংগঠিত মেহনত। যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি পরিচালিত হবে জাতির উপর চেপে বসা সেক্যুলার কুফরী শাসনের আধিপত্য অপসারণ এবং জাতির মাঝে তাওহিদি চেতনা ব্যাপক করার লক্ষ্যে। যে মানহাজের অনুসারীরা কুফরী শাসনের পতন হোক বা না হোক, সমাজে নবিগণের দাওয়াহ তথা তাওহিদের চেতনাকে প্রবল করতে ভূমিকা রেখেই যাবে.... যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়ার সময় আসে!

উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের নিজস্ব দাবি দ্বারা, অথবা নিছক কোন নাম ও পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে কোনোকিছু সাব্যস্ত হয় না। বরং, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা হবে দাওয়াত ও মেহনতের বস্তুনিষ্ঠতা এবং মানহাজ।

সঠিক বিপ্লবী সংগঠনই আমাদের জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক পদস্খলনগুলো বুঝার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এবং

এমন এক ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চিন্তা লালন করে, যাকে নেতৃত্ব দিবে ইসলাম।

একারণে বিপ্লবী সংগঠনের জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় যে, তারা তাওহিদের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। কেননা বহু ইসলামপন্থী জামাত এমন পরিবেশে বেড়ে উঠে, যেখানে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান। কিন্তু তারা এগুলোর দিকে মাথা তুলেও তাকায় না। যেন এসকল সংগঠনগুলো হলো স্রেফ রাজনৈতিক সংগঠন। আর শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজের উপায়সমূহের একটি উপায় হিসেবে জিহাদ বা বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে।

আমাদের জাতি ও সমাজের মাঝে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বিচ্যুতিগুলোর প্রতিকারে বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সঠিক মানহাজের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা খুবই জরুরী। কারণ বিপ্লবী আন্দোলনই অন্যান্য একসময় ইসলামি সংগঠনগুলোকে এমন শারঈ রূপ প্রদান করতে সক্ষম, যা সামগ্রিকভাবে ইসলামি আন্দোলনকে সাহাবাদের প্রজন্মের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে!

তাই যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলন বা জিহাদি আন্দোলনই কেবল নাম, পরিভাষা ও দাবির কারণে ঢালাও আনুগত্যের উপযোগী হবে না। বরং দেখা হবে তাদের দাওয়াহ, মানহাজ, মানসিকতা ও লক্ষ্য অর্জনে সক্ষমতার দিকগুলোও।

অতএব, শারঈ, ঐতিহাসিক ও বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নবিগণের উত্তরসূরী, তাওহিদের ইমামদের প্রস্তাবিত মানহাজের স্বরূপ নিয়ে আসলে কি?

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম বলেন,

> "অতএব, যারা কুফরের সাথে সংঘাতের চিন্তা বাদ দিয়ে ইসলামি আন্দোলনের কর্মী জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ বা বিশ ভাগে পৌছার অপেক্ষা করে; এবং বলে যে, 'শতকরা দশ কিংবা বিশ ভাগ জনগণ যখন ইসলামি আন্দোলনের কর্মী হবে, তখন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব', তারা সমাজের প্রকৃতি, দাওয়াতের নীতি ও পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টিগত সুন্নাহ উপলব্ধি করেনি ।
>
> ইসলামি আন্দোলনের কর্মী সংখ্যা জনসংখ্যার একশ ভাগের পাঁচ কিংবা দশ ভাগে এসে পৌঁছা কখনোই সম্ভব না। এটা অবাস্তব স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না।
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের দিকে দেখুন।
>
> মক্কার তের বছরে তাঁদের সংখ্যা ছিল শতের কাছাকাছি।
>
> জিহাদের পথে অগ্রসর হওয়ার পর বদরে গিয়ে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩১৩ (তিনশ তের) জনে।
>
> উহুদে গিয়ে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০০ (সাতশ) এ।
>
> হুদাইবিয়ায় গিয়ে তাঁদের সংখ্যা এসে উপনীত হয় ১৪০০ (চৌদ্দশ) এ।
>
> মক্কা বিজয়ের দিন তাঁদের সংখ্যা হয় ১০০০০ (দশ হাজার) ।
>
> কেন এত বিরাট পার্থক্য!?
>
> ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার হল, কীভাবে?
>
> এর কারণ, যুদ্ধে হেরে কুরাইশরা তাঁদের দম্ভ অহংকারকে খুইয়ে স্বীকার করে নিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই তারা তাঁর হাতে কর্তৃত্বের চাবি তুলে দিতে বাধ্য হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি আরব দ্বীপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাজনৈতিক প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি

করল। ফলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করা শুরু করল। কারণ, মানুষের ইসলামগ্রহণে কুরাইশদের দম্ভ ও আল্লাহর দ্বীনের সাথে তাঁদের শত্রুতা বড় বাঁধা ছিল।

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা যখন তাঁদের দম্ভ অহংকার থেকে হটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হল, তখন জনসাধারণ মনে করল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিজয় অনিবার্য। ফলে তাঁরা ব্যাপক ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল এবং কুরাইশরা পরাজয় স্বীকার করে নিল।

মক্কা বিজয় রমযানে হয়েছিল। নবম হিজরীর জুমাদাল উখরা বা রজব মাসে তথা মক্কা বিজয়ের নয় মাস পর তাবূক অভিযান পরিচালিত হয়। মুসলমানদের সংখ্যা মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার ছিল। কিন্তু তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজারে। বিপুলভাবে বর্ধমান এ সংখ্যা মুসলমানদের সামরিক-রাজনৈতিক বিজয়েরই ফল। দশম হিজরীর শেষের দিকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ করতে গিয়েছিলেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা এসে পৌঁছে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারে।

শক্তিশালী না হলে মানুষ আপনার পক্ষ নিবে না। দুর্বলতা ও কষ্টের সময় গণমানুষের পক্ষে আপনার সাথে এসে দাঁড়ানো কল্পনাতীত ব্যাপার। কারণ, গণমানুষ অবস্থা দেখেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেছেন—

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেল, আর আপনি মানুষকে দেখছেন, তারা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে।"

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পরই মানুষ আল্লাহর দ্বীনে গণহারে দীক্ষিত হয়। দুর্বলতা ও কঠিন পরিস্থিতির সময় কেবল সেসব দুর্লভ ও অনন্য-সাধারণ লোকেরা তোমার পাশে থাকবে, যারা ত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।"

আমাদের এই ইমাম আরো বলেন,

"সমাজবিপ্লব, জাতি গঠন ও সম্মান পুনরুদ্ধারের যে পথনির্দেশ আমাদেরকে দান করা হয়েছে, তার মর্মকথা হচ্ছে এই যে, বিপ্লবের জন্য একটি শুদ্ধি-আন্দোলন অপরিহার্য, যা শুরু হবে তাওহিদের দাওয়াতকে সামনে রেখে। অতঃপর জাহিলিয়াত তার সর্বশক্তি নিয়ে তাওহিদের এই দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে।

শুরু হবে উভয়ের মধ্যে সংঘাত। মুমিনরা ধৈর্য্যধারণ করবে। অতঃপর এমন দিন আসবে, মুমিনের দল তাদের রব্বের ইচ্ছায় বজ্রের ন্যায় অগ্রসর হয়ে, উম্মাহর শক্তি ও কল্যাণকে বিস্ফোরিত করবে। জনসাধারণ তাদের পক্ষ নেবে এবং লোহা ভক্ষণকারী ঈমানদাররা এ জলন্ত চুলায় (ময়দানে) ত্যাগ দিতে থাকবে এবং সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

এ সংঘাতের প্রধান উপকরণ ইসলামি আন্দোলনের বীর সৈনিকেরা। মাঝপথে দুর্বল ও কাপুরুষেরা ঝরে পড়তে থাকবে আর দৃঢ়পদরা পথ চলা অব্যাহত রাখবে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর লড়াইয়ের উত্তাপে আত্মাগুলো পরিশুদ্ধ হবে এবং হৃদয়গুলো পরিচ্ছন্ন ও চকচকে হবে।

আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর সম্মানের আচ্ছাদন বানাবেন, তাদের বিজয়ের ফলগুলোকে হেফাজত করবেন, তাদেরকে তার দ্বীনের বিশ্বস্ত সংরক্ষক বানাবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করবেন।"

শায়খ আবু বকর বলেন,

"যখন থেকে মুসলিম জাতির উপর হেদায়েতের সূর্য উদিত হয়েছে তখন থেকেই তাদের উপর ধারাবাহিক নানান পরীক্ষা ও মসিবত আপতিত হয়েছে। মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হয়। অনেক সময় মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন সময়গুলো আসে, ইসলামের হেদায়েত পাওয়ার আগে। তবে ঈমানের প্রফুল্লতা অন্তরে মেশার পর পরীক্ষা আর ফিতনা ব্যক্তির অন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অনুভূতি তৈরি করে। বিয়ের ফিতনা, সম্পদের ফিতনা, চাকরি কিংবা রোজগারের ফিতনা, নানান ধরনের ফিতনার মুখোমুখি তাকে হতে হয়। কিন্তু ঈমানদার যখনই সফলতার সাথে কোন ফিতনার মোকাবেলা করে, তখন সেই ফিতনার মাত্রা অনুযায়ী অন্তরে তাঁর অন্তরে একটি সাদা ফোঁটা পড়ে। অর্থাৎ তার অন্তরে গুনাহর কারণে যে কালো দাগ পড়েছিল তা দূর হয়। পাশাপাশি তাঁর ঈমানও উন্নতির দিকে উঠতে থাকে।

সাহাবীদের প্রজন্মের ঈমান শুরু থেকেই শক্ত ছিল, ব্যাপক ছিল। তারা শুরু থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসব পরীক্ষার সামনে তাদের অবিচলতা আর দৃঢ়তার ফলে তাদের ইমানের স্তর আরো উঁচু হয়েছিল। ইমান আরো মজবুত আরো শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজকের অনেক মাশায়েখ এবং উস্তাদরা আমাদের দুঃখদুর্দশা বয়ে আনতে পারে এমন সব কাজ এড়িয়ে যাবার শিক্ষা দেন।

এভাবে আমরা অবনতি ও অধঃপতনের যাত্রা শুরু করি। আমাদের ঈমানী হালতের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। আমাদের ঈমান মজবুত হয় না, বরং যা ছিল তা আরো দুর্বল হয়।

একইভাবে আমরা দেখি যে, প্রথম প্রজন্মের মধ্য থেকে যারা মক্কাতে হেদায়েতের আলোতে আলোকিত হয়েছিলেন তাঁদের কুফরী শক্তির কর্তৃত্বের ফিতনা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আর যারা মদীনায় হেদায়েত পেয়েছিলেন তাঁদের জিহাদের এবং তরবারির ঝনঝনানির মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

(তাই হকপন্থীদের কাফেলা) বাতিলের সামনে বলিষ্ঠভাবে হক তুলে ধরে, বস্তুগত ও আত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আনসার সংগ্রহ করে (তথা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা গ্রহণ করে); কিন্তু স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও কারাগারকে বরণ করে নেয় না। তবে বন্দিত্ব ও পরীক্ষা এসে গেলে ধৈর্যধারণ করে এবং এটাকে শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে।

বিপরীতে আরেক দল রয়েছে, যারা এ ব্যাপারে বেশ শিথিলতা করে থাকে। বিপদের আশংকা আছে এমন সব কাজ থেকে তারা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। যেমন বাতিলের সামনে স্পষ্ট হক বলা অথবা বাহ্যিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে তারা বিরত থাকে। কিন্তু কোনো কাজ না করলেও গর্বভরে চিৎকার বলাবলি করে, আমরা এখন মাক্কী জীবনে আছি। আমরা সবরের পর্যায়ে আছি। আমি জানি না, মাক্কী জীবনের কোন বিধান তারা পালন করছে। তাদের অবস্থান হল নিফাক, কুফরের সাথে মিশ্রন, সহাবস্থান এবং প্রতারণার।"

অর্থাৎ, আদর্শের প্রভাব বিস্তার ও বিজয়ের ক্ষেত্রে বাতিলের সাথে সংঘাত অনিবার্য। এই কঠিন দায়িত্ব আদায়ে উম্মতের মাঝে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও জামাত আবশ্যক যারা দ্বীনকে প্রবল করবেন, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসবেন। আর সাহাবাওয়ালা এমন নেতৃত্ব ও জামাত, যা গড়ে ওঠে কেবল হক আঁকড়ে ধরার কারণে উদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতিতেই। আরামদায়ক আলস্য ও বিলাসী জীবনযাত্রার মাঝে সময় অতিবাহিতকারীদের মধ্য থেকে এমন নেতৃত্ব ও জামাত উঠে আসে না।

সুতরাং, নববি মানহাজের আলোকে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী নেতৃত্ব ও আন্দোলনের জন্য সুসাব্যস্ত মূলনীতি হচ্ছে,

ক) সঠিক মানহাজের আলোকে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত মেহনত,

খ) এর ফলে আগত পরীক্ষা ও বিপদ সত্ত্বেও অবিচল ও সুদৃঢ় থাকা এবং

গ) প্রতিকূলতার মাঝেও আন্দোলনকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করা।

এ উদ্দেশ্যে নবিজি (সা.) ও মুহাজির সাহাবাদের মানহাজই হবে অনুসৃত।

আর সেই মানহাজ হচ্ছে, কুফরের ইমামদের (আমাদের সমাজে কুফরের ইমাম হচ্ছে, সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা, বুদ্ধিজীবি ও কালচারাল এলিটদের ত্রিমুখী শয়তানী অক্ষ) শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে জাতির মাঝে বলিষ্ঠ সাংগঠনিক মেহনত। হকের অগ্রগতি ঠেকাতে কুফরি শক্তির আগত আঘাত সত্ত্বেও ইস্তিকামাত থাকা এবং ইহতিসাব তথা সাওয়াবের আশা রাখা আরো উদ্যমী হয়ে জাতির মাঝে মেরুকরণে আরো জোরদার মেহনত জারি রাখা।

এই তিনটি বিষয় হবে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক বিপ্লবী কর্মসূচীতে অংশ নেয়া প্রত্যেক নেতা ও অনুসারীর মেহনতের ভিত্তি!

فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِكِیۡنَ

"অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৪)

اِنَّا كَفَیۡنٰكَ الۡمُسۡتَہۡزِءِیۡنَ

"নিশ্চয় আমরা বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৫)

وَ لَقَدۡ نَعۡلَمُ اَنَّكَ یَضِیۡقُ صَدۡرُكَ بِمَا یَقُوۡلُوۡنَ

"আর অবশ্যই আমরা জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়;" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৭)

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ كُنۡ مِّنَ السّٰجِدِیۡنَ

"কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন;" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৮)

وَ اعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتّٰی یَاۡتِیَكَ الۡیَقِیۡنُ

"আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদাত করুন।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৯)

অতএব, ইসলামি বিপ্লব সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় যোগ্য নেতৃত্ব ও জামাত প্রাথমিকভাবে অগ্রসর হবে, জাতির মাঝে তাওহিদের দাওয়াহ প্রবল করার মাধ্যমে মেরুকরণে ভুমিকা রাখার দ্বারা। নবি (সা.) এর মুহাজির সাহাবারা যেভাবে সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর আলোকে মেহনত করেছিলেন, তার আলোকে।

অর্থাৎ, সমাজে তাওহিদ ও কুফরের (সেক্যুলারিজম) মেরুকরণের ফলে উভয় পক্ষের শক্তির ভারসাম্য কমে আসবে। আর এক্ষেত্রে বাতিল শক্তির আঘাত তো অনিবার্যই, কারণ দাওয়াহ ও দলীলের ময়দানে হককে পরাজিত করা তার সম্ভব না। তাই হক তীব্র হলে, বাতিল তাকে শক্তির মাধ্যমেই দমন করতে চাইবে। তাই দাওয়াহ ও বাতিলের সাথে সংঘাত, এই মূলনীতির আলোকে সুসংগঠিত আন্দোলন ঈমান, আত্মত্যাগ ও অবিচলতাকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর ইচ্ছায়—এমন আসবাব গ্রহণ করবে; যা উপযোগী পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়ে বিপ্লব সম্পাদনে সক্ষম হবে।

তাই, এখন বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতির অর্জনের আগ অবধি, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক (فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِكِیۡنَ) মূলনীতির আলোকে হক ও বাতিলের মেরুকরণ স্পষ্ট করে দেয়ার ধারাবাহিক ও সুসংগঠিত মেহনত চালিয়ে যাওয়াই হবে নবিগণের মানহাজের অধিক নিকটবর্তী! আল্লাহই ভালো জানেন।

এ উদ্দেশ্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রে তাওহিদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করা হয় দাওয়াহ ও সংগঠনের মাধ্যম। কেননা, বিপ্লবের

জন্য অপরিহার্য হলো—আদর্শিক ভিত্তি, সামরিক ও ঈমানী প্রস্তুতির পাশাপাশি উপযোগী পরিস্থিতি তৈরী ও তাকে কাজে লাগানোর সক্ষমতা।

আফসোসের বিষয় হলো, সাধারণ এক দল তো উপযোগী পরিস্থিতি না থাকার অজুহাত দিয়ে গণতন্ত্র, ব্যালট বাক্স আর আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে সামাজিক শক্তি অর্জনের চিন্তা বাদ দিয়েছে। আবার আরেক দল উপযোগী পরিস্থিতি আনয়নের মেহনত বাদ দিয়ে স্রেফ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, সামরিক প্রস্তুতি বা শক্তি অর্জনের ভাসাভাসা মেহনতকেই যথেষ্ট মনে করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, শক্তি বলতে কেবল গোলাবারুদ আর মানুষের জমায়েত বোঝায় না। শক্তি বলতে প্রশিক্ষণের মতো বিমূর্ত বিষয় যেমন বোঝায়; একইভাবে উপযোগী পরিস্থিতি ও মুহাজিরিনদের জামাতের ন্যায় আদর্শের উপর দীক্ষালাভকে আরো বেশী বোঝায়; যা সমকালীন জামাতগুলো উপেক্ষা করেছে। অথচ, আল্লাহর রাসুল (সা.) ও রব্বানী ব্যক্তিবর্গ শারঈ ও সার্বজনীন সূত্র অনুযায়ী পরিস্থিতির আলোকে শক্তি অর্জন করেই শত্রুর উপর বিজয়ী হয়েছেন।

তারা ভুলে গেছেন বা ইমামদের মানহাজকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি যে, শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে—বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি প্রস্তুতকরণ এবং বিশুদ্ধ ফিকর, ঈমানী সংহতি ও কঠিন মেহনতের মাধ্যমে গড়ে ওঠা যোগ্য নেতৃত্ব ও জামাত; যারা যে কোনো পরিস্থিতি ও উপকরণ নিজেদের অনুকূলে পাওয়ামাত্র যথাযথ আনুগত্য ও কুরবানীর মাধ্যমে বিজয় অর্জনে সক্ষম।